ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 690- 696
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.259

সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’: ধীবর সংস্কৃতির আলোকে

প্রিয়া দে, *অতিথি অধ্যাপক, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Samaresh Basu was an eminent Bengali writer in modern literature. He wrote different type of novels, short stories. His first novel ‘Uttaranga'(1951) focuses on the life realities of the hard-working people living on both banks of the Ganges. Nearly a half century after writing ‘Uttaranga', Samresh Basu once again wrote a novel about Ganga River and related with the life of the fishermen and others living beside the river. Among the river centred novels, samaresh Basu's ‘Ganga'(1957) stands a unique place. In this novel, he described how this struggling life of the fishermen and their traditions resolve around the Ganges. They survived their dangerous life with the uncertainty and their old traditional believes and customs. The fishermen fate, believes in good and evil, Ghosts and spirits, goddesses and ritualistic worship - all of these aspects are showed in the novel. Apart from other writers, who writes about river and river related man, samaresh Basu’s ‘Ganga' make a different place in Bengali literature.

Keywords: Traditions, Religious believes, fishing technique, struggling life, Spirits, Occupation

সাহিত্য হল সমাজ সংস্কৃতির দর্পণ। বস্তুত কোনো একটি জাতির বা সমাজের নিজস্ব আচার-আচরণ, ধর্ম বিশ্বাস, রীতি-নীতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সব কিছুরই সমষ্টি হল সংস্কৃতি। সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসটি ধীবরদের সংস্কৃতিগত পরিচয়ের মুখপাত্র। বাংলা উপন্যাস যেসময় তার প্রথম দিকের অভিজাত পরিমণ্ডল ছেড়ে নানা শ্রমজীবী মানুষের জীবন কথাকে তুলে ধরার যে প্রয়াস শুরু করেছিল, সেই প্রয়াসেরই হাত ধরে সাহিত্যে জায়গা পেল বিশেষ বৃত্তিজীবী মানুষের সংগ্রামমুখর জীবন কাহিনি। তার সাথে উপন্যাসে, ছোটগল্পে উঠে এলো বিপদ সংকুল ও সংগ্রামশীল জীবনে অভ্যস্ত জেলে সমাজের জীবন কাহিনি- যা লেখক থেকে পাঠক সকলকেই আকৃষ্ট করেছে।

‘গঙ্গা’ যেমন সমরেশ বসুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত ফসল তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ (১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) উপন্যাসগুলিও নদীকেন্দ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনযাত্রার একটি পূর্ণ আলেখ্য। কিন্তু নদীকেন্দ্রিক বাসিন্দাদের নিয়ে যতগুলো উপন্যাস রচিত হয়েছে তাতে ‘গঙ্গা’র আসন সবার উপরে। এ তথ্যের স্বপক্ষে অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের একটি অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন-

> "জলের সঙ্গে মানুষের এই সংগ্রাম, এই মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র পাই না আমরা অন্য কোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে, অন্তত এমনি করে। তিতাসকে অবলম্বন করেও মানুষ হিসেবে হয়তো বেঁচে ওঠা যায় অন্তত তার প্রমাণ, কিন্তু সেই কল্পবীজ এ উপন্যাসে শাখায়িত হতে পারেনি। হোসেন মিয়া ময়নামতীর দ্বীপে পদ্মার প্রতিস্পর্ধী এক জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু তার সে প্রয়াসও রহস্যময় থেকে গিয়েছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে মালো পরিবারের মাছমারা ছেলে সমুদ্রের স্বপ্ন এমনভাবে লালন করেছে মনের মধ্যে, প্রতিহত করা যায়নি তাকে। গঙ্গাকে এভাবে পেরিয়ে যেতে পারে বলেই গঙ্গা এই জাতীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র।"[১]

সমরেশ বসুর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১)। যেখানে তিনি গঙ্গা তীরবর্তী মনুষের জীবন বাস্তবতা অঙ্কন করেছেন। তার প্রায় বেশ কয়েক বছর পর আবার গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই তিনি একটি উপন্যাসের পরিসর নির্মাণ করলেন। আসলে গঙ্গা তীরবর্তী আতপুরের তরফদারপাড়ায় বাস করার সুবাদে গঙ্গা এবং তার মাছমারাদের সঙ্গে লেখকের গড়ে উঠেছিল নিবিড় জানাজানির সম্পর্ক। লেখকের এই নিবিড় সম্পর্ক কিন্তু ছায়া দেখে নয়, কায়া দেখে। ১৯৫৭ সালে শারদীয় সংখ্যা 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গঙ্গা' উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণের পেছনে রয়েছে আরেক পটভূমি। তিনি আতপুরে থাকার সময় মালোপাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেতেন। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন জাল, জল ও জেলে জীবনের গৃহস্থালি। তাদের হাসি-কান্না, ক্ষোভ, অভিমান, টানাপোড়ন, মহাজন, সুদ-ধার, বিনিদ্র রাত্রিযাপনের ফসল 'গঙ্গা'-য় এসে প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো বিশেষ রচনা নির্মাণের পেছনে থাকে এক শিল্পীর দীর্ঘদিনের সাধনা, অধ্যাবসায়। আসলে একজন লেখক যখন বিশেষ কিছু সৃষ্টির প্রয়াসে একটি জনপদকে বেছে নেন, তখন তিনি সে অঞ্চল এনং অঞ্চলে বসবাসকারী সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানার চেষ্টা করে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। যেমন- পার্ল এস বার্ক তাঁর 'The Good Earth' রচনার পূর্বে দীর্ঘদিন চিনে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। এরকম আরও অনেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। সমরেশ বসুও তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য তাঁর যেসব মৎস্যজীবী বন্ধুদের কাছে তথ্য সংগ্রহের জন্য যেতেন তাদের সকলের কথা উল্লেখ করেছেন গ্রন্থের ভূমিকা অংশে। তিনি তাঁর ঋণ স্বীকার এবং দায়বদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তার পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এঁদের সঙ্গে অনেক দিন ও রাত্রি আমার কেটেছে গঙ্গার বুকে। এদের সাহায্য ছাড়া গঙ্গা রচনার সম্ভব ছিল না।"[২]

একজন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনা নির্মাণের প্রয়াস সাহিত্যের কোনো শৌখিন মজদুরি নয়। সমরেশ বসুও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। এক্ষেত্রে তিনি ধীবরদের জীবন সম্পর্কে আদ্যপ্রান্ত জানার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হালিশহরের রামপ্রসাদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিমাই চাঁদ অধিকারীর একটি মন্তব্য স্মরণীয়-

> "প্রায়ই আসতেন এবং গঙ্গায় মাছধরাদের নিয়ে হাজার প্রশ্ন করতেন। নৌকায় বসে তাঁর হাজার প্রশ্ন। সমানে চলল তাঁর নোট নেওয়া। তা প্রায় ৩/৪ বছর হবে। মাছধরাদের একটা নিজস্ব ভাষা (Technical words) আছে আমি তা খেয়াল করিনি।..... পেশার সাথে ভাষার এত মিল সমরেশদার প্রশ্ন করার আগে পর্যন্ত সত্যি কথা বলতে কি বুঝিনি। গঙ্গা বইতে সেই সব শব্দের কিছু প্রতিফলন হয়েছে।"[৩]

'গঙ্গা' দক্ষিণের মাছমারাদের অর্থাৎ দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের গল্প। সেই মৎস্যজীবীদের মধ্যে রয়েছে জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো ও রাজবংশীরা। গঙ্গাকে কেন্দ্র করে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং

পূর্ব-উত্তর দিক থেকে আসা গ্রামাঞ্চলের মৎসজীবী মানুষের জলনির্ভর সংগ্রামশীল জীবনধারা আবর্তিত হয়েছে। ধলতিতা, তেঁতুলিয়া, সারাপুর, খোড়গাছি, ফতুলোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর আঁতুড়ে, ইটিন্ডে, দণ্ডিরহাট, শাখচুড়া, টাকি প্রভৃতি গ্রামের জেলেরা গঙ্গাবক্ষে ভিড় জমিয়েছে জীবনের দাবিতে। মৎস্যজীবীদের ঘটনাবহুল জীবনে একদিকে মৎস্য শিকারের রোমাঞ্চ অন্যদিকে অনিশ্চিত বিপদসংকুল ভয়াবহ জীবনের সাথে পুরনো সংস্কারকে আকড়ে ধরে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা- এসবই উপন্যাসের কাহিনীকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। অলঙ্ঘ্য সমুদ্র, ঝড়জলের নদীতে মালোদের সংগ্রামী জীবনকে প্রতি মুহূর্তে মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের কাছে। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের রীতিনীতি সমাজ সংস্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'গ্রন্থে বলেছেন-

> "একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গুরু বর্ণনা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভশুধু উহাদের জীবনযাত্রার বহির্ঘটনাই চিত্রিত করেন নাই। উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবনবোধের সমস্ত প্রদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্রদীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদঘাটিত করিয়াছেন।"[৪]

জীবন-জীবিকার বিপর্যস্ত সংগ্রামের জাতাকালে মাছমারারাদের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে তীব্র সংস্কার। সমুদ্রযাত্রায় পাড়ি দেওয়ার সময় তারা বিশেষভাবে মান্যতা দেয় পাঁজিপুঁথিকে। নিবারণ মালো ও তার ভাই পাঁচুর মত আরও অনেক মালোও সেকারণেই যাত্রার সময় নির্ধারণ করে এভাবে-

> "দক্ষিণের ভিটের চালায় অর্ধেকের উপর রোদ উঠে গেছে। মাথার কাছে বাঁধা আছে কঞ্চি। কঞ্চির গায়ে যতক্ষণ রোদ না লাগবে, ততক্ষণ যাত্রার সময়। রোদ লেগে গেলে যাত্রা নাস্তি।"[৫]

আবার যাত্রাপথে কাঁকড়া, কচ্ছপ, কলার দর্শনকে তারা চিহ্নিত করে অমঙ্গল রূপে। নিবারণ মালো যেবার তার শেষ সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল সেবারও তারা যাত্রাকালে একজোড়া কচ্ছপের দর্শন পেয়েছিল। সেটা দেখে পাঁচু ও সাইদার নিবারণের বুকের মধ্যে নিঃশব্দে অলুক্ষণের বিদ্যুৎশিখা চিকচিক করে উঠেছে। অজন্ম লালন করা বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে নিবারণের সমুদ্রে মিলিয়ে যাওয়াতে। জেলেরা কোনো মাছমারার মৃত্যুকে গুনিন লোপাটের ষড়যন্ত্র বলে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যু চকভাঙ্গা মাছের লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে যায় জেলেদের। নিবারণ সর্দারের মৃত্যু তারই অনুরূপ। পাঁচু মালো বলে ওঠে-

> "ওর যে বড় দুর্জয় টান। নেশার চেয়েও দামি জিনিস। তখন আর ঘর গৃহস্থ, সামনে পিছনে কোন কিছুর খেয়াল থাকে না। মনে থাকে না টাকার লালসা। আদিগন্ত সমুদ্রের ফোসানি গর্জানি কানেও ঢোকে না কারুর। চক ঘিরে পাটা জাল ফেলে তুলে ফেলা নিয়ে কথা, ওই ফেলে তুলতে তুলতেই যে কত দূর টেনে নিয়ে যায়, সে খেয়াল হয় পরে।"[৬]

নৌকার সর্দারের মৃত্যু মানে গোটা সাইয়ের নিপাত যাওয়ার সংকেত। এরপর সবাইকেই এবছরের মতো সেদিনই ফিরে আসতে হবে, তাদের বিশ্বাস নইলে আর কেউ ফিরবে না।

মাছমারাদের অটুট বিশ্বাস- যতদিন তারা গঙ্গাবক্ষে থাকবে, ততদিন কেউই চুল দাড়ি কাটবে না, কাপড় ছাড়বে না। কেননা নিয়ম ভঙ্গ করলেই অনাচার ঘটবে। আর অনাচার মানেই মৃত্যু। সমুদ্রে কোনো মাছমারার মৃত্যু হলে সেই স্থানে অগুনন্তি কাশের মুন্ড জট পাকিয়ে বেঁধে রেখে আসতে হয়। এটা নতুন কোনো

মাছমারার কাছে সাবধান হওয়ার সংকেত চিহ্ন। এই বিশ্বাস তারা বংশানুক্রমে মেনে চলে আসছে। নিবারণের মৃত্যুর পর তার ভাই পাঁচু সেই স্থানে কাশের গুচ্ছ বেঁধে রেখে আসতে না পারলেও বিলাস সেই নিয়ম পালন করে এসেছে। মাছমারারা যে কয়েকমাস মৎস্যশিকারের অভিযানে থাকে সেসময় তারা প্রতিটি দিনক্ষণ-পর্ব-লগ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখে। নানা ধরনের বিপদ থেকে নিজেদের সচেতন রাখার জন্য তারা তাদের মননে লালন করে নানা সংস্কার। তাদের অভিধান পূর্ণ থাকে ভরা কোটাল, মরা কোটাল, অমাবস্যা- পূর্ণিমার কোটাল, অষ্টমী, নবমী, দশমী, তিথি প্রভৃতি শব্দবন্ধে। মাছ ধরার সময় এই প্রত্যেকটি কোটাল, তিথিকে কেন্দ্র করেই জেলেদের বিশ্বাস এবং ধারণা আবর্তিত হয়। পাঁচুর বক্তব্যের প্রসঙ্গে উপন্যাসিক মাছমারাদের সংস্কারকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> "এই যে দেখছিস বর্ষায় জল বাড়ছে একেই বলে জোয়ান কোটাল, তার রকম আছে। পারাপারের মাঝির কাছে, এই জোয়ান কোটাল।জল আরও বারে ধরিত্রী রসস্থ হন অমাবস্যায় পুন্নিমাতে।.... তবে বর্ষাকালে পূর্ণিমার কোটালের জোর বেশি। দ্বিতীয়া পর্যন্ত টান কাঁপানি থাকবে। একেবারে চরমে উঠে, চতুর্থীতে ঢিল দেবে। দিতে দিতে অষ্টমীতে গিয়ে বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। দশমীতে একেবারে শেষ।"[৭]

কখন মাছ গঙ্গাবক্ষে তার পোনা ছাড়বে, আবার জালে কখন ইলিশ ধরা দেবে- এ সম্পর্কে পাঁচুদের বিশ্বাস অত্যন্ত অভ্রান্ত।

সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসটিকে উৎসর্গ করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উপন্যাসটির বেশ কিছু স্থানে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাকের উপকথা' উপন্যাসের প্রভাব রয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে যেমন ত্রিকালক সুচাঁদ বুড়ির স্মৃতিকথার মাধ্যমে ভগবান কালরুদ্রের পুরাণকথা বর্ণনা করেছেন, তেমনি সমরেশ বসুও তাঁর 'গঙ্গা'-য় ধলতিতার রামমালোর মাধ্যমে তাদের পূর্বপুরুষের আবির্ভাবের কাহিনী বিবৃত করেছেন। মালোদের প্রথম পুরুষের রহস্যময় আবির্ভাবের প্রসঙ্গে তাদের বিশ্বাস-

> "চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরুষ আগে। ওয়ার কল্যাণেই সমুদ্দুর পাড়ের মালো বংশ বড় হয়েছেলে, ছইড়ে পড়েছেলে। মালোরা ত্যাখন রাজা হয়েছিল দেশের।"[৮]

জনশ্রুতি অনুযায়ী মালোদের দক্ষিণ দে হেঁটে এসেছিলেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে। কালো কুচকুচে পুরুষ, কোঁচকানো চুল, খালি গা, হাতে বড় এক ক্যাঁচা। কিন্তু ডাঙায় এসে বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। কেননা ডাঙ্গা দক্ষিণ রায়ের অর্থাৎ বাঘের রাজ্য। উভয়ে খুব যুদ্ধ হয়েছিল। দক্ষিণ রায় খুশি হয়ে একটি গায়ের ছাল ওনাকে পড়তে দিলেন। মালোদের পূর্বপুরুষের আসল মূর্তি বাঘের ছাল পরা, ক্যাঁচা হাতে কালো কুচকুচে পুরুষ এবং তাদের রাজ্য হল- গোটা সমুদ্রের পার ধরেই।

মাছমারারা তাদের অসহায় দুর্ভাগ্যপীড়িত পতিত জীবনকে মেনে নিয়েছে নিয়তির দন্ডস্বরূপরূপে। তারা নিজেদের পতিতজীবনের কাহিনিকে গড়ে তুলেছে মনসাদেবীর লৌকিক কাহিনিযোগে। লোকপুরাণ ও মালোদের কল্পবুদ্ধি মিলিয়ে কাহিনিটি এরূপ:

> "ঝালো আর মালো, দুই ভাই। এক মায়ের সন্তান, জন্ম নিলে ভগবানের গলার মালা থেকে। কে করছে আর পাঁজিপুঁথি তত্ত্ব-তলাস। গাঁয়ের লোকে বলে, শোনেও গায়ে ঘরের লোকে। তা ও দুই ভাই-ই ভগবানের বিধেনে হয়েছে মাছমারা।..... বাপ ঠাকুরদার মুখে শোনা কথা। আমরা জানি, এই আমাদের বৃত্তান্ত।"[৯]

বংশপরম্পরায় ধরে প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, গুরুদেবের আদেশ অমান্য করার শাস্তিস্বরূপ মালোরা আজও পতিত এবং এটাকেই তারা তাদের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে। মালোদের জীবন নানা সংস্কার,

আধিভৌতিক বিশ্বাসে ভরপুর। শিক্ষা ও নাগরিক সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত মালোরা তাদের জীবনে অভাব-অনটন, শোষণ- বঞ্চনার সাথে নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসকে লালন করে চলে এসেছে। তাদের অনিশ্চিত জীবনে মৃত্যু নানা রূপে, নানা ছদ্মবেশে আসে। পাঁচু যখন প্রথমবার তার দাদার সাথে সমুদ্রে যাত্রা করে তখন নিবারণ মালো তার ভাইকে সাবধান করে বলেছিল-

> "ডাঙ্গার তুক, বড় তুক। নোঙর ফেলে বসে আছিস গালে হাত দে।শুনতে পাবি, কে যেন ডাকছে ডাঙ্গা থেকে। ফিরে তাক্কে দেখবি, মানুষ, মেইয়ে মানুষ।.... তোকে ডাকছে, ওগো ভালো মানুষের ছেলে, ও মাঝি, বাঁচাও গো! আমার কেউ নাই গো! দেখবি একপিঠ চুল, ফুটফুটে মুখখানি, ডাগর ডাগর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।.... কিন্তু খবরদার। যাস তো ওই যাওয়াই শেষ যাওয়া।"[১০]

জলে থাকাকালীন জেলেদের জন্য মৃত্যু নানা ফাঁদ পেতে বসে থাকে।ফাঁদে পা দিলেই মৃত্যু নিশ্চিত। টিকটিকির ডাককে মালোরা বেদবাক্য তুল্য মান্যতা দিয়ে থাকে। টিকটিকিকে তারা শুধু একটিমাত্র জীব ভাবে না। তারা মনে করে-

> "খনার জিভখানি কেটে নে মিহির রেখে দিয়েছিলেন গর্তে। সেই জিভটি খেয়ে ফেলেছিল টিকটিকিতে। খনার বচন হল বেদবাক্যি। জিভ খেয়ে ফেলে টিকটিকিরও গুন হয়েছে ডাকের।"[১১]

সকলে এসব মানলেও বিলাস কিন্তু এই ধরনের অন্ধবিশ্বাসকে মানতে নারাজ।

একদিকে সংসার সংগ্রামের দ্বন্দ্ব অন্যদিকে আধিভৌতিক বিশ্বাস- এই দুই-ই মাছমারাদের জীবনকে অসহায় করে তোলে। চৈত্র মাসে তাদের দুর্দিন আরও বীভৎস রূপ ধারণ করে। সমুদ্র ধাক্কা দিচ্ছে চৈত হাঁকিয়ে, সেই সঙ্গে ঘরে প্রাদুর্ভাব ঘটে পেত্নীর। এমন সময়ে গুনীন, ওঝা, মন্ত্রপড়া মানুষজনরা মাছমারার কাছে ভরসার পাত্র। তাদের মন্ত্র, ফুঁকই তো জেলেদের শারীরিক সুস্থতার অস্ত্র। গুণিনের মন্ত্রের জোরে এবং পেত্নীর বলা কথার আড়ালে মাছমারাদের গার্হস্থ্য জীবনের দুর্বিষহ চিত্রটি ধরা পড়ে-

> "ধরব না মাথায় সিঁথেয় বাসি সিঁদুর। পেটে দুদিন ভাত নেই। এয়োস্ত্রী মানুষ, রুক্ষ চুল, কানি পরণে, লাজ নেই, লজ্জা নেই, আঁচলে গিঠ নেই, পায়ে আঙ্গুলে আংটা নেই।"[১২]

অন্ত:পুরবাসিনীদের দুঃসহ জীবনযাপনের কাহিনি চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার বারোমাস্যার চেয়েও অনেক বেশি বেদনাদায়ক। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন- এই চারমাস জেলেরা মন ভরে দুবেলা খেতে পায় এবং তাদের সংসারেও লক্ষ্মীশ্রী চেহারা ফুটে ওঠে। কিন্তু বাকি কয়েক মাস অভাব যেন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে সামিল হয়। পেট চালাতে ফ্রি বছর ঋণ নিতে বাধ্য হয় মহাজনের কাছে। বাঁধা পড়ে নৌকা, জাল এমনকি বাস্তুভিটেটুকু। মাছমারাদের অভাবী জীবনের বিধিলিপিতে তাদের স্ত্রী পরিবাররাও ছাড় পায় না। ওঝার স্তোকবাক্য পেত্নীর কাছেও বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তাই তার কণ্ঠেও অভিযোগের সুর শোনা যায়-

> "মিছে কথা, মিছে কথা তোদের। নিজেরা পাস না খেতে, তোরা আমাকে খাওয়াবি।.... মাছ নেই, জল নেই, জাল নেই লৌকো নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই, পান নেই।"[১৩]

নিত্য অভাব, অভিযোগের অসহায়তা এবং আধিভৌতিক বিশ্বাসের কাছে মালোরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

আধিভৌতিক বিশ্বাস ছাড়াও মাছমারাদের মধ্যে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস অটুট। তাদের উপাস্য দেবতা হলেন খোকাঠাকুর এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী ইনিই হলেন মাছেদের দণ্ডমুন্ডের কর্তা। তারা দেবতার আকার কখনো দেখেনি কিন্তু মাছের গোল চোখকে ভাবে খোকাঠাকুর। এজন্যই মালোর স্ত্রীরা তাদের ঘরের বিপদে আপদে প্রার্থনা জানায়-

> "খোকাঠাকুর জাল ভরে, খাল ভরে, মাছ দাও। তুমি দিলে, আমি আমার স্বামীর হাসি মুখ দেখব, ঘরে আমার সোহাগের বান ডাকবে।"[১৪]

খোকাঠাকুরের কৃপায় যখন জাল ভরে মাছ উঠে আসে, তখন সুদিনের বান বয়ে যায় জেলেপল্লীতে। এরপর শ্রাবণের টোটার সময় যখন মাছমারারা দিশেহারা সেসময় তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। একটা সময় আসে যখন মা গঙ্গা তার মীনশস্যগুলোকে লুকিয়ে রাখে জলের তলায় তখন নিরুপায় হয়ে জেলেরা তাদের আরাধ্যদেবী মা গঙ্গার শরণাপন্ন হয়। তাদের মুখে নেই কোনো প্রতিবাদের ভাষা, শুধু অভিমানভরা কণ্ঠে মায়ের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। শ্রাবণের মন্বন্তর সংহার মূর্তি ধারণ করলে, মালোদের জীবিকার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। সেসময় তারা গঙ্গার পূর্ব দিকে চরায় একটু মাটির বেদী পেতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। একেই বলে নলেন টানা-

> "বেদির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুজন। এই দুর্জয় সংহারিনী গঙ্গার সাক্ষাৎ চায় তারা। এই তাদের বিশ্বাস।..... তারা গোল হয়ে হরিধ্বনি দেয়। জোয়ারের বেলায় এসে নাম গান করে।.... সারা অঙ্গ কাঁপে থরথর করে। বেদীর সামনে মুখ ঘষে গ্যাজলা উঠে বাসি মুখে।"[১৫]

গঙ্গাই তাদের টিকে থাকার উৎস। গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই তাদের সকল বিশ্বাস আবর্তিত হয়েছে। সেজন্য মা গঙ্গার নিষ্ঠুরতার কাছে তারা মাথা নত করে এবং নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার আকুতি জানিয়ে পূজো দেয়। এ সমস্ত পুজো ছাড়াও তারা পালন করে চৈত্র শেষে সন্ন্যাস নেওয়া, ঢ্যালাপ্যালার পুজো, আষাঢ়ে অম্বুবাচী প্রভৃতি পার্বণ। মালোদের বিশ্বাস অনুযায়ী অম্বুবাচীর দিন দুধ খেলে আর সাপ কামড়াবে না। এজন্য বিলাসের মা একটু দুধ জোগাড় করে এনে সবার মুখে তুলে দেয়। আবার ঢ্যালাপ্যালার পুজোয় তারা মা ধরিত্রীর জন্য নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয় এভাবে-

> "মাঠের মাঝখানে গিয়ে ঢ্যালা মাঠে সাজিয়ে দিয়ে আসবে নৈবেদ্য। বাজিয়ে ফিরবে শাঁখ, কাশি।"[১৬]

মাছমারাদের সর্বজনীন গঙ্গাপূজোর নাম সাজার। সাজার হল-

> "মাছমারাদের সার্বজনীন গঙ্গাপূজো। সবাই মিলে চাঁদা দেয়। হাতে ধরে কেউ টাকা-পয়সা দেয় না। মাছমারারা একটি ভাটার পাওয়া মাছ সব দিয়ে দেয়, যাদের উপর সাজারের ভার থাকে। তাকে বলে সাজভাটা।"[১৭]

এ উৎসব শুধু মাছমারাদের মধ্যেই সীমিত থাকে না। আশেপাশের গৃহস্থ, আধা গৃহস্থ, দেহপোজীবী সকলেরই সার্বজনীন পূজো। কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো চাঁদার নিয়ম নেই, যে যা পারে তাই দেয়। কলকাতা থেকে বড়বড় যাত্রাদল আসে, চার-পাঁচ রাত ধরে যাত্রাগান চলে, মাইক সহযোগে গান হয়। মেয়েরা সাজসজ্জা করে উৎসবে সামিল হয়। উৎসবের বর্ণনায় লেখক বলেছেন-

> "সাজার এসে গেল। পাড়ার মধ্যেই একটি খোলা জায়গা মাথায় তেরপল দিয়ে দিব্যি ঢাকা হয়েছে। প্রতিমার মাটির সঙ্গে রং পড়ে গেছে। ঢাক- কাশি উঠেছে বেজে।"[১৮]

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস শুধুমাত্র নদীনির্ভর মানুষের জীবন চিত্রায়নের গল্প নয়, উপন্যাসটি একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়ের জীবন্ত দলিল। নিয়তির প্রতি অসীম বিশ্বাস ও পেশার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে মাছমারারা তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করে চলেছে। এই সংগ্রামে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে কুসংস্কার, নানা ভ্রান্ত ধারণা, ধর্মীয় বিশ্বাস, পূজার্চনা প্রভৃতি। তবে এই ধর্মীয় বিশ্বাসই তাদের

প্রাণচঞ্চল করে রেখেছে। গঙ্গা ও গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের সামাজিক সংস্কার, বিশ্বাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নিয়ে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' সত্যিই প্রশংসনীয়।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, সমরেশ। গঙ্গা: একটি সমীক্ষণ। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ. জ।
২. বসু, সমরেশ। গঙ্গা (ভূমিকা অংশ)। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০২৩
৩. বসু, সমরেশ। গঙ্গা: একটি সমীক্ষণ। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃ. গ।
৪. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৪১৫।
৫. বসু, সমরেশ। গঙ্গা। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ. ৬।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
১১.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।